প্রেমাংশুর রক্ত চাই

নির্মলেন্দু গুণ

(কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশিত-১৯৭০

হুলিয়া

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর,
চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্র;
আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন
একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।
কেউ চিনতে পারেনি আমাকে,
ট্রেনে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে
আগুন চেয়ে নিয়েছিলুম, একজন মহকুমা স্টেশনে উঠেই
আমাকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল,
একজন পেছন থেকে কাঁধে হাত রেখে চিৎকার করে উঠেছিল।
আমি সবাইকে মানুষের সমিল চেহারার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।
কেউ চিনতে পারেনি আমাকে, একজন রাজনৈতিক নেতা
তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন, মুখোমুখি বসে দূর থেকে
বারবার চেয়ে দেখলেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না।
বারহাট্টায় নেমেই রফিজের স্টলে চা খেয়েছি,

অথচ কী আশ্চর্য, পুনর্বার চিনি দিতে এসেও
রফিজ আমাকে চিনলো না।
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর পরিবর্তনহীন গ্রামে ফিরছি আমি।
সেই একই ভাঙা পথ,
একই কালোমাটির আল ধরে গ্রামে ফেরা,
আমি কতদিন পর গ্রামে ফিরছি।
আমি যখন গ্রামে পৌঁছলুম তখন দুপর,
আমার চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ,
শো শো করছে হাওয়া।
অনেক বলে গেছে বাড়িটা,
টিনের চল থেকে শুরু করে পুকুরের জল,
ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গরুর গোয়াল;
চিহ্নমাত্র শৈশবের স্মৃতি যেন নেই কোনোখানে।
পড়ার ঘরের বারান্দায় নুয়ে পড়া বেলিফুলের গাছ থেকে
একটি লাউডুগী উত্তপ্ত দুপুরকে আর লকলকে জিভ দেখালো।
স্বতঃস্ফুর্ত মুখের দাড়ির মতো বাড়িটির চতুর্দিকে
ঘাস, জঙ্গল, গর্ত, আগাছার গাঢ় বন গড়ে উঠেছে অনায়াসে;
যেন সবখানেই সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে
এখানে শাসন করছে গোঁয়ার প্রকৃতি।
একটি শেয়াল একটি কুকুরের পাশে শুয়েছিল প্রায়,
আমাকে দেখেই পালালো একজন,
একজন গন্ধ শুঁকে নিয়ে আমাকে চিনতে চেষ্টা করলো
–যেমন পুলিশ-সমেত চেকার তেজগাঁয়
আমাকে চিনতে চেষ্টা করেছিল।
হাঁটতে হাঁটতে একটি গাছ দেখে থমকে দাঁড়ালাম,
অশোক গাছ, বাষট্টির ঝড়ে ভেঙে যাওয়া অশোক,
একসময় কী ভীষণ ছায়া দিতো এই গাছটা;
অনায়াসে দু'জন মানুষ মিশে থাকতে পারতো এর ছায়ায়।

আমারা ভালোবাসার নামে একদিন সারারাত
এ গাছের ছায়ায় লুকিয়েছিলুম।
সেই বাসন্তী, আহা, সেই বাসন্তী এখন বিহারে,
ডাকাত স্বামীর ঘরে চার সন্তানের জননী হয়েছে।
পুকুরের জলে শব্দ উঠলো মাছের, আবার জিভ দেখালো সাপ,
শান্ত-স্থির-বোকা গ্রামকে কাঁপয়ে দিয়ে
একটি এরোপ্লেন তখন উড়ে গেলো পশ্চিমে ...।
আমি বাড়ির পেছনে থেকে শব্দ করে
দরোজায় টোকা দিয়ে ডাকলুম, 'মা'।
বহুদিন যে দরোজা খোলেনি,
বহুদিন যে দরোজায় কোনো কন্ঠস্বর ছিল না,
মরচে পড়া সেই দরোজা মুহূর্তেই ক্যাচক্যাচ শব্দ করে খুলে গেলো।
বহুদিন চেষ্টা করেও যে গোয়েন্দা বিভাগ আমাকে ধরতে পারেনি,
চৈত্রের উত্তর দুপুরে, অফুরন্ত হাওয়ার ভিতরে সেই আমি
কত সহজেই একটি আলিঙ্গনের কাছে বন্দী হয়ে গেলুম;
সেই আমি কত সহজেই মায়ের চোখে চোখ রেখে
একটি অবুঝ সন্তান হয়ে গেলুম।
মা আমাকে ক্রন্দনসিক্ত একটি চুম্বনের মধ্যে
লুকিয়ে রেখে, অনেক জঙ্গলের পথ অতিক্রম করে
পুকুরের জলে চাল ধুতে গেলেন।
আমি ঘরের ভিতরে তাকালুম,
দেখলুম দু'ঘরের মাঝামাঝি যেখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ছিল,
সেখানে লেনিন, বাবার জমাখরচের পাশে কার্ল মার্কস;
আলমিরার একটি ভাঙা কাচের অভাব পূরণ করছে
স্কুপস্কায়ার ছেঁড়া ছবি।
মা পুকুর থেকে ফিরছেন, সন্ধ্যায় মহকুমা শহর থেকে
ফিরবেন বাবা, তাঁর পিঠে সংসারের ব্যাগ ঝুলবে তেমনি।
সেনবাড়ি থেকে খবর পেয়ে বৌদি আসবেন,

পুনর্বার বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন আমাকে।
খবর পেয়ে যশমাধব থেকে আসবে ন্যাপকর্মী ইয়াসিন,
তিন মাইল বিষ্টির পথ হেঁটে রসুলপুর থেকে আসবে আদিত্য।
রাত্রে মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে আমতলা থেকে আসবে আব্বাস।
ওরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করবে ঢাকার খবর :
–আমাদের ভবিষ্যৎ কী?
–আইয়ুব খান এখন কোথায়?
–শেখ মুজিব কি ভুল করছেন?
—আমার নামে কতদিন আর এরকম হুলিয়া ঝুলবে?
আমি কিছুই বলবো না।
আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা সারি সারি চোখের ভিতরে
বাংলার বিভিন্ন ভবিষৎকে চেয়ে চেয়ে দেখবো।
উৎকন্ঠিত চোখে চোখে নামবে কালো অন্ধকার, আমি চিৎকার করে
কন্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার জ্বালা মুছে নিয়ে বলবো :
'আমি এসবের কিছুই জানি না,
আমি এসবের কিছুই বুঝি না।'

অশোক গাছের নিচে

কী আগুন খেলছে দুপুরে, আমি উবু হয়ে চোখ বুজে
আকাশের দিকে পিঠ রেখে অশোক গাছের নিচে
শুয়ে আছি, আমার সমান দীর্ঘ কাঠের চেয়ারে,
সুর্যময় গাছের ছায়ায়। শরীরে আগুন নিয়ে শুয়ে আছি,
দালি-র জেব্রার মতো প্রজ্বলন্ত শুয়ে আছি। কাছকাছি
সামান্য বাতাস যেন নেই, কলাপাতা কাঁপছে না,
একটি ফড়িঙ দিব্যি বাতাসের সাথে বাজি ধরে
ঘোড়ার কেশরে বসে আছে– শিশুর শিশ্নের মতো,

কিছুই বোঝে না যেন, প্রাণহীন, উত্তেজনাহীন
নিস্তেজ বোধে ন্যুব্জমুখ। তবে কি সমস্ত হাওয়া
রিকশা কিংবা মোটরের টায়ারে ঢুকেছে?
কালোবাজারির মতো হয়তো সে বাতাসের মহাজন,
সমস্ত বাতাসগুলো বন্দী করে রেখেছে গোপনে,
নদী তীরে বিশাল গুদামে, মশাখালী স্টেশনের কাছে;
চাটগাঁয় অথবা ঢাকায় তুমি চৈত্রের সব হাওয়া
বুকে করে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে
ফ্রিজের ভিতরে শুয়ে আছো।
উত্তেজিত সেভেনাপে কী শীতল জমছো বরফে!
অশোক গাছের নিচে হাওয়া নেই,
ক্রমশ হলুদ পাতা ঘাম হয়ে পিঠে-মুখে ঝরছে বগলে।

মিউনিসিপ্যালিটির ট্রাক

মিউনিসিপ্যালিটির ভাঙা-ট্রাকে শহরের সবকিছু,
আমাদের যাবতীয় শোভন খাদ্যের পরিণতি,
ড্রামের আবর্জনা, ড্রেনের হলুদ বমি, রোগীদের কাশ,
পচা-মুরগির রান, পাখা, কলার বাকল
প্রতিদিন খুব ভোরে তুলে দেবে কতিপয় নির্দিষ্ট মেথর।
আর নগরের সুখে-থাকা বনেদিবাসীরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে
যখন আঙুল দিয়ে চোখ থেকে টেনে আনে সোনালি কেতুর,
তখন অনেক দুরে, শহরের শেষ-ঢালু বেয়ে নেমে যায়
মেথরের গান, ভাঙা মোটরের হর্ন।
একজন সূর্য ওঠায়, প্রিয়তম সূর্য প্রতিদিন;
অন্যজন প্রতিভোরে গেঞ্জিহীন ননীর শরীরে
সযত্নে মালিশ করে শীতের রোদ্দুর,

এবং সন্ধ্যা এলেই আবর্জনা নিষ্কাশনে সারাদিন
ব্যবহৃত ট্রাক বৃদ্ধ গরুর মতো ঝিমোয় একাকী,
পথিপার্শ্বে, মানুষে চলাচল ছেড়ে দূরে, অসহায়।
হয়তো সে ভাবছে আবার কখন আগামীকাল
সূর্য ওঠার আগেই সেই নির্দিষ্ট মেথর এসে
নিয়ে যাবে তাকে, তার শূন্য পিঠে তুলে দেবে
ট্রেনে কাট-পড়া কুকুরের ভুঁড়ি, ছাগলের শিঙ,
রক্তমাখানো তেনা, অন্ধকারের অবৈধ মৃত-ভ্রূণ,
পচা-বাসী ভাত, ফেন, চৌকোর কাঠ,
কিছু মাটি, কিছু জল ....
সে-সব জঞ্জাল বয়ে সেই ট্রাক যাবে দ্রুত
পুনর্বার শহর শেষের ঢালু গর্ত-ভূমিতে
যেখানে নির্মিত হবে একটি প্রাসাদ।
আবর্জনা পচে গিয়ে মূল্যবান ভিত্তিভূমি হলে
আবাসিক একটি এলাকা সেখানেও মাথা তুলে
কালো ড্রামে ছড়াবে থুথুকে।
মিউনিসিপ্যালিটির ভাঙা-ট্রাক তবুও বাজাবে হর্ন
তারস্বরে বিভিন্ন সকালে।

সবুজ কাক

কা কা করে ডাকে কালো মেঘ,
কালো যুবতীর দেহে-গড়া লোহার জাহাজে
পলিমাটিমাখা চাঁদ,
জন্মভূমির ছায়া সবুজ কাকের মতো
জীবনের রক্তে বসে আছে।
কা কা করে ডাকে মেঠো পথ, কাশবন,
গারো পাহাড়ের হাওয়া, শ্রীমতীর চর।

আমাকে কে যেন ডাকে, শ্রাবণে বর্ধিত নদী?
মধুপুর? দক্ষিণের একাকী সাগর?
কা কা করে ডাকে অন্ধকার, বাংলার জলে ভাসে
প্লাবনের হাঁস, সবুজ কাকের ঝাঁক উড়ে যায়,
চতুর্দিকে পুড়ে যায় রুগ্ন কচি ঘাস।
জন্মভূমি বেড়ে ওঠে মানুষের নামে, মাংসে ক্ষতের মতো
জ্বলে ওঠে সীমান্তের লোহার সীমানা, আমার বয়স বাড়ে
যৌবনের মতো দ্রুত বাংলার পরিধি বাড়ে না।

জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দবাদ

বাসন্তী হলুদে হাঁটো, তাই বাস নেমে পড়ি
নীল মেডিকেলে; অথচ টিকিটগুলো শ্যামলী, শ্যামলী।
তুমি বোললে খোলাচুলে কালো ব্যাজ, শোকচিহ্ন হয়,
বুকে কালো ফিতে বাঁধা পুরুষে মানায়, তুমি বোললে তাই,
পাঞ্জাবিতে কালো ফিতে গাঁথলো আলপিন।
‘শহীদেরা ফুল ভালবাসে, সবগুলো গোরস্থানে দেবো’
–তুমি বোললে তাই অনেক ফুলের গাছ
আমার অশ্লীল স্পর্শে লণ্ডভণ্ড হলো,
সূর্যমুখী, রক্তজবা, ক্রিসেনথিমামে।
তুমি বোললে তাই আমরা এগিয়ে গেলাম,
নিষ্পাপ কিশোর মরলো আবদুল গণি রোডে।
তুমি বোললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে,
আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত-অত্যাচারে
‘গীতাঞ্জলি’ অকর্মণ্য হবে।
আমরা তাই রঙিন-প্ল্যাকার্ড
সাজিয়েছি মাও সে তুং, গোর্কি, নজরুলে।
তুমি বোললে পাপ, ক্রান্তিকালে নির্জনতা,

ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা খোঁজা,
আমি তাই আলোড়িত সশব্দ মিছিলে
পল্টনের জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ।
তুমি বোললে প্রেম হবে, প্রেমের ভুবন যদি আসে
বুকের কুসুম থেকে দেবে শব্দাবলী, কবিতার বিমূর্ত চন্দন।
আমি তাই যে কোনো কঠিন মূল্যে প্রেমের ভূবনখানি চাই।
যদি কভু প্রেমে পড়ি! একদিন প্রেমে পড়বো।
প্রেম সত্যি হবে?

চুক্তি

তোমার আমার ভালোবাসাবাসি চুক্তি
স্বাক্ষরে সারা শহর উঠলো ফুঁসে।
অবৈধ প্রেম অশ্লীলতার দোষে
দণ্ডিত হলো নাচের নিপুণ মুদ্রা।
যৌবন ঢাকা কংলালসার গ্রীষ্মে
দেখাবে কি তবে বিশশতকের বিশ্বে
বৃদ্ধ-বোধের অবাধ-মুনাফা, মুক্তি?
তোমার আমার ভালোবাসাবাসি চুক্তি
ভেস্তে গেলেই ব্যস্ত শহরে আসবে
প্রতিবাদহীন সর্বজনীন প্রেম?

ভালোবাসার টাকা

একটি টাকা রেখে দিলুম, কাল সকালে
টিফিন করে তোমার মুখ দেখতে যাবো।
একটি টাকা বুকপকেটে রেখে দিলুম
কাল সকালে তোমাকে আমি দেখতে যাবো।

বুকের কাছে একটি টাকা ঘুমিয়ে আছে,
 কাল সকালে জলের দামে শহীদ হবে।
আমার চোখ তোমার দেহে হাজার চোখ,
একটি টাকা হাজার টাকা সে-উৎসবে।
আগামীকাল সকাল হবে ভালোবাসার,
নাশতা করেই তোমাকে আমি দেখতে যাবো।

জলের সংসার

জলে ভেসে একটি রূপার থালা এসে গেছে সোনার শহরে।
নাগরিক, সামরিক নির্বিশেষে রিলিফে নিযুক্ত মানুষ
চতুর্দিকে ভিড় করে দেখছে থালাটা
ভাসছে নৌকার মতো জিন্নাহ অ্যাভিন্যুতে।
যেন নতুন শহরে এসে গ্রামের যুবক দু'চোখে অবাক মেখে
দেখছে শহর, রাজধানী; খুঁজছে গুলিস্তান, শবনম এবং রাজাকে।
সেনাবাহিনীর লোক চতুর্দিকে ভিড় করে আছে,
 দু'হাতে রিলিফ নিয়ে আসছে সমাজসেবী,
ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ।
বেয়াদপ এই থালা গ্রাম্য কৌতুক ভেবে হাসছে একাকী,
সূর্যের নিক্ষিপ্ত আলো প্রত্যাখ্যান করছে কেবল।
 থালাটা ভাসছে জলে, যেন কোনো স্পীডবোট
 গভীর-গভীরতর শহরের অনেক গভীরে যেতে হবে তাকে।
যেন মূর্খ অভিভূত জীবনানন্দের চাষা জানে না নিজের সাধ্য,
শুধু যেতে চায় অভিযোগ সাথে করে গণভোটে নির্বাচিত
 নেতার মতন হয়ে ভেসে ভেসে রাজার সভায়।
চারদিক থেকে লোক এসে দেখছে থালাটা,
বাংলাদেশের মতো শান্ত স্থির রূপার থালাটা
কী করে এমন হলো?

তখন ট্রাফিক এসে টোকা দিলো থালাটার গায়,
শব্দ হলো, জলতরঙ্গের মতো মিহি সুর।
বাটাল, হাতুড়ি দিয়ে মনে হলো কারা যেন
 হাজার হাজার অশ্বক্ষুর কেটে দিচ্ছে,
রবিবারে রেসকোর্সে দৌড়াবে সবাই।
সীতার মুখের মতো এই থালা কে জানে কে ছিল কার ঘরে?
কে জানে কে ঘরের চৌকাঠে থালাটি সমুখে নিয়ে
 বসতো কোথায়? কে জানে কী স্বপ্ন ছিলো, সংসার শৈশব ছিল
আনন্দের সুখ-স্মৃতি মাখা; অথচ সে চিনে নিলো ঢাকা।
 আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি তাকে,
এই থালা, যেন উলঙ্গ সুন্দরী নারী
হেঁটে হেঁটে শহরের ফুটপাত ধরে যাচ্ছে কোথাও।
স্বাধীনতা, মানবতা এবং সভ্যতা;
শব্দ ক'টি চোখে নিয়ে থালাটা ভাসছে একা।
আমার রূপার থালা, যে কখনও আসেনি শহরে;
প্লাবন এনেছে তারে সাগরের মতো বড়ো
জলের সংসারে, গেলাসের পাশে।
থালাটা এগিয়ে যাচ্ছে নির্বিকার সম্রাটের দিকে।

অসভ্য শয়ন

তুমি এলেই দেখতে পেতে, শুয়ে-থাকাটাই ঘুম নয়,
চারদিকে মশারির মতো নেমে-আসা সমস্যার ভিতরে
 কিছু নেই, কেবল কবর খোঁড়ে অন্ধকার চোখের ব্যথায়!
আমি যত কাছে টানি, আলো তত দূরে সরে যায়!
তুমি এলেই দেখতে পেতে, শুয়ে-থাকাটাই ঘুম নয়।
আমার বুকের মধ্যে একটি এনোফিলিস্ কেন সারারাত
জেগে থাকে, আমি কেন সারারাত সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে

কুকুরের মতো, রাজাদের বাবা হয়ে অসভ্য ভাষায়
শুয়ে থাকি। জেগে থাকি।

যানবাহন নেই

কোন দিকে যাবে? দক্ষিণে জল, সমুদ্রে বসে আছি।
উত্তরে পবর্তমালা কণ্ঠে দেবো শেফালি ফুলের–
কোন দিকে যাবে তুমি?
পালাবার পথ নেই, ব্যারিকেড চতুর্দিকেই,
যেন আন্দোলন চলছে প্রত্যহ।
যানবাহন চলবে না, আজকে অফিস নেই,
ভালোবাসা, তোমাকেও নগ্নপদে হেঁটে যেতে হবে।
হাতের তালুর দাগ, রৌদ্রে বালিশের মতো
উল্টে দেবো সব রেলপথ, ইঞ্জিনেও লাগাবো আগুন,
তোমাকে ও অজস্র যাত্রীকে।
আমার চোখের কাছ দিয়ে, আমার বুকের কাছ দিয়ে,
আমার ভালোবাসার ফুটপাত ধরে তোমাকে হাঁটতে হবে।
আজ হরতাল, সমগ্র শহর জুড়ে আজ হরতাল।
গাড়ি-ঘোড়া নেই। ব্যারিকেড চতুর্দিকেই।
আকাশে অনেক ভয়, বাতাসেও নিষ্প্রদীপ আলোর মহড়া।
এরোপ্লেন গুলি করে ভূপাতিত করলে মাটিতে
প্লেনক্রাশে ভেঙে যাবে ডানা, সুন্দর মুখের ছাঁচ,
তোমার দেহের মতো প্রিয়তমা দেশের সীমানা।
কোনোদিকে পথ নেই, এ-পথেই হেঁটে যেতে হবে,
মানুষের কাছে, কলরবে।
আমি বসে আছি, তোমাকে দেখবো বলে বসে থাকি,
কতদিন ধরে বসে আছি, তোমাকে বলবো বলে বসে আছি :
‘আজ হরতাল, আজ ভালোবাসবার শুভদিন’

প্রেমাংশুর রক্ত চাই

নিষিদ্ধ ভুবনগুলি অতিক্রম করে গেলো যারা,
রাতের আঁধার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যে ক্রুদ্ধ জীবন জনতা
অতিক্রম করে গেল বাধা, অথবা অতিক্রমণের মুখে
যারা রোজ বাঁধা পড়ে,
সেইদিনও বাঁধা পড়েছিল, এবং আগামী রাতেও
বিদ্ধ হবে যারা; বকনের মতো কাচা রমনীর প্রেম ভুলে গিয়ে–
ভালোবাসা, আনন্দের অভিলাষ মিথ্যে ধরে নিয়ে
যারা রোজ সমর্পিত, বন্দী হয় বিরুদ্ধ-খোঁয়াড়ে,
সাজিয়ে সুরের সাথে মনের আঁধার প্রতিদিন :
–আমি একা রমণীকে ভালোবেসে-বেসে নিজেরি মুদ্রাদোষে
নিঃসঙ্গ বৃক্ষের মতো রাত্রিদিন আলাদা হলেও
ছিলাম নদীর মতোই সমর্পিত সাগর মিছিলে সেইদিন।
তারও আগে বহুদিন–, সেইসব মানুষের সাথে,
তাহাদেরই সাথে প্রতিদিন আমিও রয়েছি মিশে,
ছিলাম সেদিনও; এই পৃথিবীর, এই মানুষের
এই বাঙলার সূর্যমুখর শিশিরের প্রতিবাদে।
আমাকে থাকতে হতো, আমাকে থাকতে হয়,
আমাকে থাকতে হবে, আমাকে থাকতেই হবে
লালশালুঘেরা স্টেজে, বক্তৃতায়, পল্টনের
মাউথ-অর্গানে, গণসঙ্গীতের নির্যাতিত রাতে।
মারমুখো অন্যায়ের রাহুগ্রাসে আমাকেও দিতে হবে
প্রতিবাদে নৃশংস আগুন। লাঙ্গলের লাল ফালে,
বাস-ট্যাক্সি-লরীর আগুনে, হাসপাতালের উর্বর বেডে,
ইমার্জেন্সির নিমর্ম শয্যায়, মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণায়,
অনুর্বর বিমুখ ফাগুনে –আমাকে থাকতে হবে,
আমাকে থাকতে হয় এইসব মানুষের যেকোন আগুনে।

মানুষের কোলাহল ঘৃণা করে
জনতার চিৎকার থেকে দূরে, বহু দূরে
নিজেরি গোপন-ক্রণে কতবার হয়েছি শহীদ,
টোপে-গাঁথা মৎস্যের মতো একাকী রমণে কত
 করেছি নিহত রাত্রিদিন অন্ধকারে শুধু রমণীকে।
এনেছি আকাশ থেকে নীলিমার পাপ,
আর প্রাচুর্য বিশ্বাস, তবু কোনো কল্যাণী নিঃশ্বাস
বিনিময়ে দিয়েছি কি কেউ?
কোনো কিছুতেই কোনোদিন কেউ কিছু
দেবে না জেনেও কতবার ভেবেছি একাকী
 বাড়ির পাশের রোগা নদীটির কাছে বসে বসে :
–মানুষ যেমন একা, অসহায় নিজের কাছেই
একদিন যদি ধরে পড়ে যায় সে তখন কোন অজুহাতে,
 কার নামে চোখ থেকে ফেরাবে মৃত্যুকে?
 মানুষ কী করে পারে জীবন এবং মৃত্যুর মহিমাকে
রক্ত থেকে অস্বীকার করে শেফালির মৃতদেহ
কাঁধে নিয়ে মিছিলে দাঁড়াতে?
বহুদিন আসক্তিকে আরাধনা ভেবে
নীলিমার সারা দেহ সাজায়েছি মাধবীর স্তনে,
আর ঠিক সেইক্ষণে, বাইরে যখন
মানুষ এগিয়ে গেলো মানুষের দিকে–
 (মানুষ এগিয়ে যাবে চিরকাল মানুষের দিকে?)
বন্দুক শোনালো তার অন্তিমের গান,
আগুন জানালো তার সর্বগ্রাসী ধ্বংসের আহ্বান
 এ্যাম্বুলেন্সের নীল হাসপাতাল
 চলে এলো মৃত্যুর প্রতিরোধে, পথের বালক
যখন মৃত্যু-চিৎকারে আকাশে চৌচির হলো ফেটে,
কাঁদানে গ্যাসের সাথে থেকে-থেকে

মানুষের শান্ত চোখগুলো
যখন টকটকে লাল হলো ফুলের মতন
–আমি তো তখন মৃত্যু, আলিঙ্গন তুচ্ছ মনে করে
ডিমের খোলশ ভেঙে পাখির মতন
রাজপথে বেরিয়ে এসেছি, যেখানে মানুষ তার
জীবনের সব প্রাপ্য এসেছে মেটাতে।
মানুষ যেদিন সঙ্গীতের মিহিসুর ভুলে গিয়ে
প্লাবনের কল্লোল দেখে প্রলয়ের চিৎকার দিয়েছিল,
অথবা মানুষ যখন নিছক বর্ষণে
ভিজে-ভিজে হয়েছিল কাক,
সেদিন আমিও ছিলাম;
মানুষের সাথে মিশে আমিও সেদিন
আটটি ফুঁটোর বাঁশি, উষ্চাঙ্গের অবোধ্য সেতার
ভেঙেছি নির্জন রাতে দু'পায়ের চাপে,
সার্ট খুলে বুকে করে নিয়েছি বৃষ্টিকে
–এবং বুঝেছি হয় চিৎকার কখনও সঙ্গীত।
আমিও তো তোমাদেরই মতো প্রতিবাদে বলেছি তখন,
'প্রেমাংশুর বুকের রক্ত চাই, হন্তার সাথে আপোস কখনো নাই।'
বুকের বোতাম খুলে প্রেমাংশুকে বলিনি কি—'দেখো,
আমার সাহসগুলি কেমন সতেজ বৃক্ষ–,
বাড়ির পাশের রোগা নদীটির নীল জল থেকে
প্রতিদিন তুলে আনে লাল বিস্ফোরণ?'

জালনোট

যেনবা ভিক্ষুক ছাড়া আর যত সম্পন্ন মানুষ সবাই জনক তার
পথচারী সকলের বিনীত সন্তান একটি ভিক্ষুক প্রতিদিন
মুখ থেকে সিগারেট লুকিয়ে রেখে আমার সমুখে পাতে হাত,

প্রাগ্রসর এই সভ্যতার পায়ের চপ্পল ধরে বসে থাকে পথে।
ভিক্ষা দিতে যেটুকু সময় প্রয়োজন, সেটুকু সময় মধ্যে
অস্পষ্ট আলোর নিচে মুহূর্তের নেচে ওঠা হাত,
আমার প্রেমের মতো চতুর্দিকে প্রসারিত হাত
কেঁপে কেঁপে আকাশের দিকে উঠে যায়,
পরম করুণাময় মানুষের অসহায় বিশ্বাসের দিকে নত হয়,
মনে হয় মলিন চিহ্নের মতো কররেখা যেন কারো হাত নয়;
জালনোটে ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্য নিয়ে বসে থাকা জাতির জনক।
এই ভিক্ষুকটাকে আমি আর কোনোদিন পয়সা দেবো না,
রাজদন্ড এনে দেবো হাতে। নাকি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেবো
ভিক্ষার্থে নিযুক্ত হাত সে-সব হাতের দিকে,
যে-সব যমের হাত রাজদন্ড ধরে বসে থাকে?

একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী

এই গ্রাম উঠে যাবে, সভ্যতার কুটিল কুৎসায়,
ধিক্কারে, ষড়যন্ত্রে শুষ্ক হবে নদী।
এই গ্রাম উঠে যাবে;
সরল নিসর্গাবলী বন্দী হবে শহরে, সিটিতে।
Ambrose Wheelturner*
–শ্রদ্ধেয় অমিয়বাবু এরকম ভয়ে ভীত,
অথচ একটি গ্রাম তো প্রায় উঠে গেল
কেড়ে নিল সর্বনাশা ভয়াল নীলিমা;
অসভ্য নিসর্গ এসে ভেঙে দিল তাকে।
কৃষ্ণচূড়ার গাছ, টিউবল, তালপাতা, সোনা মসজিদ,
রহিমা খালার বাড়ি, গোরুর গোয়াল,
ধ্বংসকারী একটি বোমার চেয়ে বেশি বীর্যবান
ডেস্ট্রাকটিভ একটি গোধূলি হাওয়া

টর্নেডোর নাম ধরে এসে একাকার করে দিয়ে গেল,
সংসার, নিসর্গ-প্রীতি, বাড়ি-ঘর, মানুষ-মাটিকে।
চোখের দু'হাত দূরেই কালো নদী দিয়ে ঘেরা
একটি গ্রাম তো প্রায় বুকের কাছেই
বুক পকেটের মতো বুকে লেপ্টে ছিল–;
গ্রামবাসী, অভাব, গোলাপ, পাখি, বনমাথা চাঁদ।
একটি গ্রাম তো প্রায় ছিন্নমাথা
দ্বিখন্ডিত ইমামের মতো তপস্যায়
শুয়ে থাকতো পথে, মসজিদে,
বর্ষার অঝোর বৃষ্টি, গ্রীষ্মে-শরতে
শরীরে লুকাতো হাওয়া।
রাবেয়া খালার মেয়ে সুফিয়ার অনির্দিষ্ট প্রেম,
তার নগ্ন-পদযুগলের দিওয়ানা শোভায়
একটি ক্লান্ত গ্রাম শ্রমিকের মতো
বাওয়ানীর চটকল থেকে রঙিন হাওয়াই শার্ট
গায়ে মেখে ফিরতো রাত্রিতে।
একটি গ্রাম তো প্রায় বুকের কাছেই ছিল
চোখের কাছেই ছিল, হৃদয়ের খুব কাছাকাছি।
লোভন হিংসায় নয়, সেই গ্রাম উঠে গেল
মদখোর মাতাল বৈশাখে।
পরিত্যক্ত স্যুটিংয়ের শেষে
যেমন অক্ষম ক্রোধে সেট দেখে
শিল্পী, ক্যামেরাম্যান, পরিচালকের ফেরা;
তেমনি বিধ্বস্ত তুমি, হে গ্রাম,
করুণ সেটের মতো দেখছো আকাশে ঝড়,
বাস্তবের সকরুণ সর্বনাশী ফেরায়
ধুইছে সবল দেহ তোমার যুবতী কন্যা,
স্ত্রী ও সন্তান।

অনেক দুখের চাঁদ বুকে নিয়ে,
অনেক সুখের স্বপ্ন মুখে নিয়ে,
অনেক বছর ধরে গড়ে-ওঠা,
বেড়ে-ওঠা একটি গ্রাম তো প্রায়
রথের মেলার মতো উঠে গেল
আষাঢ়ের অপূর্ণ সন্ধ্যায়।
নিসর্গের কুটিল ধিক্কারে,
নববর্ষ বরণের ভোরে
একটি গ্রাম তো প্রায় উঠে গেল।
হায়, একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী,
মানুষ কি সোনালি ধান?
শ্রাবণের রৌদ্রে উঠে যাবে?

{ফুটনোটঃ কবি অমিয় চক্রবর্তীকে জেমস জয়েস এই ইংরেজী নামটি দিয়েছিলেন**}**

উন্নত হাত

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক,
পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার–
উদ্ধত পথে উন্নত হাত ডাকে,
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার।
প্রতীক সূর্যে ব্যাকুল অগ্নি জ্বলে,
সাম্যবাদের গর্বিত কোলাহলে
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
রক্তক্ষরণে সলিল সমাধি কার?
মানুষের মুখে গোলাপের স্বরলিপি
মৃত্যু এনেছে নির্মম দেবতার।

পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল...
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
মানুষের হাতে হত্যার অধিকার?
পুষ্পের নিচে নিহত শিশুর শব,
গোরস্থানেও ফসফরাসের আলো
অর্জুন সবে স্বপ্নের সম্ভবে,
আগুন লগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

এক-একটি মানুষ

একটি মানুষকে দেখলাম সূর্যোদয়ের রঙিন প্রভাত
দিনমজুরের মতো কাঁধে নিয়ে
যাচ্ছে সদরঘাটে, স্টীমারে, স্টেশনে।
একটি মানুষকে দেখলাম বয়সের বাঁকা ঠোঁটে
পোড়া সিগারেট, অফিসে ঘষছে কলম,
বাসের বাম্পারে ঝুলে দেখছে আমাকে।
একটি মানুষকে দেখলাম, পরাজিত কুক্কুরের মতো
স্ত্রীর হাতে চাবিগুচ্ছ দিয়ে তার কনিষ্ঠ সন্তানের মুখে
চুমু খেয়ে পুনর্বার অজ্ঞাত নিবাসে ফিরে গেলো।
একটি মানুষকে দেখলাম,
তার দুখিত দৈন্যের সাথে
কাউকে বাঁধলো না কোনোদিন,
চিরকাল একা একা মানুষের সাথে তার প্রেম।
একটি মানুষকে দেখলাম প্রতিটি অন্ধকারে
সে তার শরীর থেকে খুলেছে পোশাক,
অতঃপর সে হয়েছে সংসারের উন্মত্ত প্রেমিক,
স্ত্রীর ঠোঁট থেকে শুষে নিয়েছে অভাবগুলি
আদরে, চুম্বনে।

একটি মানুষকে দেখলাম মুখের মাছির মতো
মাথা নেড়ে বাসনার হাওয়াকে তাড়ায়।
একটি মানুষকে দেখলাম তবুও সে পার্ক ভালোবাসে,
তবুও সে নদী দেখে, তবুও সে রমণীর কাছে যেতে চায়।
একটি মানুষকে দেখেছি আজীবন অত্যাচারী,
তথাপি সে চিরকাল সুখে থেকে গেছে।
একটি মানুষকে জানি আনন্দের স্বভাব দেখেনি,
কোনোদিন সুখী নয়, তবুও সে দুঃখেও হেসেছে।
একটি মানুষকে দেখলাম সূর্যোদয়ের লাল রঙ
বুকে নিয়ে কী ভীষণ আশায়, বিশ্বাসে
সূর্যাস্তের দিকে যাচ্ছে,
বিকেলের দিকে,
সন্ধ্যার দিকে,
রাত্রির বিশ্রামের দিকে,
প্রভাতের প্রাত্যহিক প্রস্তুতির দিকে,
রবীন্দ্রনাথের মতো হেঁটে যাচ্ছে কবিতায়;
জীবনের সবগুলো গানে
এক-একটি মানুষ এসে
স্থান করে নিচ্ছে সবখানে।

অসমাপ্ত কবিতা

মাননীয় সভাপতি...।
সভাপতি কে? কে সভাপতি?
ক্ষমা করবেন সভাপতি সাহেব,
আপনাকে আমি সভাপতি মানি না।
তবে কি রবীন্দ্রনাথ? সুভাষচন্দ্র বসু? হিটলার?
মাও সে তুং? না, কেউ না, আমি কাউকে মানি না,

আমি নিজে সভাপতি এই মহতী সভার।
 মাউথপিস আমার হাতে এখন, আমি যা বলবো
আপনারা তাই শুনবেন।
উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমার সংগ্রামী বোনেরা,
(একজন অবশ্য আমার প্রেমিকা এখানে আছেন)
আমি আজ আপনাদের কাছে কিছু বলতে চাই।
আপনারা জানেন, আমি কবি,
রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার, এলিয়টের মতোই
 আমিও কবিতা লিখি এবং মূলত কবি।
 কবিতা আমার নেশা, পেশা
ও প্রতিশোধ গ্রহণের হিরন্ময় হাতিয়ার।
অমি কবি, কবি এবং কবিই।
কিন্তু আমি আর কবিতা লিখবো না।
 পল্টনের ভরা সমাবেশে অমি ঘোষণা করছি,
আমি আর কবিতা লিখবো না।
তবে কি রাজনীতি করবো?
কন্ট্রাক্টরী? পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক?
পত্রিকার সাব-এডিটর?
নীলক্ষেতে কলাভবনের খাতায় হাজিরা?
বেশ্যার দালাল?
 ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে তেল-নুন-ডালের দোকান?
 রাজমিস্ত্রি? মোটর ড্রাইভিং? স্মাগলিং?
আণ্ডারডেভলপমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতা?
নাকি সবাইকে ব্যঙ্গ করে
বিনয়ের সব চিহ্ন সূত্র ছিঁড়ে-খুঁড়ে
 প্রতিষ্ঠিত বুড়ো, বদ কবিদের চোখে-নাকে-মুখে
কিংস্টর্কের কড়া ধোয়া ছুঁড়ে দেবো?
–অর্থাৎ, অপমান করবো বৃদ্ধদের?

আপনারা কেউ বেশ্যাপাড়ায় ভুলেও যাবেন না,
এরকম প্রতিশ্রুতি দিলে বেশ্যার দালাল হতে পারি,
রসোন্মত্ত যৌবন অবধি, একা একা।
আমার বক্তব্য স্পষ্ট, আমার বিপক্ষে গেলেই
তথাকথিত রাজনীতিবিদ, গাড়ল বুদ্ধিজীবী,
অশিক্ষিত বিজ্ঞানী, দশতলা বাড়িওয়ালা ধনী ব্যবসায়ী,
সাহিত্য-পত্রিকার জঘন্য সম্পাদক, অতিরিক্ত জনসমাবেশ
আমি ফুঁ দিয়ে তুলোর মতন উড়িয়ে দেবো।
আপনারা আমার সঙ্গে নদী যেমন জলের সঙ্গে
সহযোগিতা করে, তেমনি সহযোগিতা করবেন,
অন্যথায় আমি আমার ঘিয়া পাঞ্জাবির গভীর পকেটে
আমার প্রেমিকা এবং 'আ মরি বাঙলা ভাষা' ছাড়া
অনায়াসে পল্টনের ভরাট ময়দান তুলে নেবো।
ভাইসব, চেয়ে দেখুন, বাঙলার ভাগ্যাকাশে
আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, সুনন্দার চোখে জল,
একজন প্রেমিকার খোঁজে আবুল হাসান
কী নিঃসঙ্গ ব্যাথায় কাঁপে রাত্রে, ভাঙে সূর্য,
ইপিআরটিসি'র বাস, লেখক সংঘের জানালা,
প্রেসস্ট্রাস্টের সিঁড়ি, রাজিয়ার বাল্যকালীন প্রেম।
আপনারা কিছুই বোঝেন না, শুধু বিকেল তিনটে এলেই
পল্টনের মাঠে জমায়েত, হাততালি, জিন্দাবাদ,
রক্ত চাই ধ্বনি দিয়ে একুশের জঘন্য সংকলন,
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কিনে নেন।
আমি শেষবারের মতো বলছি
আপনারা যার-যার ঘরে, পরনে ঢাকাই শাড়ি
কপালে সিঁদুরে ফিরে যান। আমি এখন অপ্রকৃতিস্থ
পূর্ব-বাঙলার অন্যতম ভীষণ মাতাল বক্তা একজন,
ফুঁ দিয়ে নেভোবো আগুন, উন্মাদ শহর,

আপনাদের অশ্লীল-গ্রাম্য-অসভ্য সমাবেশ;
লালসালু ঘেরা স্টেজ, মাউথ অর্গান, ডিআইটি,
গোল স্টেডিয়াম, এমসিসি'র খেলা,
ফল অফ দি রোমান এ্যাম্পায়ারের নগ্ন পোষ্টার।
এখন আমার হাতে কার্যরত নীল মাইক্রোফোন
উত্তেজিত এবং উন্মাদ।
শ্রদ্ধেয় সমাবেশ, আমি আমার সাংকেতিক
ভয়াবহ সান্ধ্য আইনের সাইরেন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে
আপনারা মাধবীর সারা মাঠ খালি করে দেবেন।
আমি বড় ইনসিকিওরড, যুবতী মাধবী নিয়ে
ফাঁকা পথে ফিরে যেতে চাই ঘরে,
ব্যক্তিগত গ্রামে, কাশবনে।
আমি আপনাদের নির্বাচিত নেতা।
আমার সঙ্গে অনেক টাকা, জিন্নাহর কোটি কোটি
মাথা; আমি গণভোটে নির্বাচিত বিনয় বিশ্বাস
রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, অথচ আমার কোনো
সিকিউরিটি নেই, একজন বডিগার্ড নেই,
সশস্ত্র হামলায় যদি টাকা কেড়ে নেয় কেউ
–অমি কী করে হিসেবে দেবো জনতাকে?
স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হলে কন্যার কাঁকন যাবে খোয়া,
আপনার আমার সকলের ক্ষতি হবে,
সোনার হাতে সোনার কাঁকন আর উঠবে না।
আপনারা ভাবেন, আমি খুব সুখে আছি,
কিন্তু বিশ্বেস করুন, হে পল্টন,
মাঘী পূর্ণিমার রাত থেকে ফাল্গুনের পয়লা অবধি
কী ভীষণ দুর্বিষহ আগুন জ্বলছে আমার দুখের দাড়িতে,
উষ্কখুষ্কু চুলে, মেরুদণ্ডের হাড়ে, নয়টি আঙুলে,
কোমরে, তালুতে, পাজামার গিঁটে, চোখের সকেটে।

দেখেছি তো কাম্যবস্তু স্বাধীনতা, প্রেমিকা ও গণভোট
 হাতে পেয়ে গেলে নির্জন হীরার আগুনে
 পুলিশের জীপ আর টায়ারের মতো পুড়ে পুড়ে যাই,
অমর্যাদা করি তাকে যাকে চেয়ে ভেঙেছি প্রসাদ,
নদী, রাজমিস্ত্রী এবং গোলাপ.....
আমি স্বাধীনতা পেয়ে গেলে পরাধীন হতে ভালোবাসি।
প্রেম এসে যাযাবর কণ্ঠে চুমু খেলে মনে হয় বিরহের
স্মৃতিচারণের মতো সুখ কিছু নেই।
বাক-স্বাধীনতা পেলে আমি শুধু প্রেম, রমণী, যৌনতা
ও জীবনের অশ্লীলতার কথা বলি।
আমি কিছুতেই বুঝি না, আপনারা তবু কোন বিশ্বাসে
বাঙলার মানুষের ভবিষ্যৎ আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন।
আপনার কী চান?
 ডাল-ভাত নুন?
ঘর-জমি-বউ?
 রূপ-রস-ফুল?
স্বাধীনতা?
রেফ্রিজারেটর?
ব্যাংক-বীমা-জুয়া?
 স্বায়ত্তশাসন?
সমাজতন্ত্র?
আমি কিছুই পারি না দিতে, আমি শুধু কবিতার
 অনেক স্তবক, অবাস্তব, অন্ন-বস্ত্র-বীমাহীন জীবনের
ফুল এনে দিতে পারি সকলের হাতে।
আমি স্বাভাবিক সুস্থ সৌভ্যগ্যের মুখে থুথু দিয়ে
 অস্বাভাবিক অসুস্থ শ্রীমতী জীবন বুকে নিয়ে
কী করে কাটাতে হয় অরণ্যের ঝড়ের রাত্রিকে
 তার শিক্ষা দিতে পারি। আমি রিজার্ভ ব্যাংকের

সবগুলো টাকা আপনাদের দিয়ে দিতে পারি,
কিন্তু আপনারাই বলুন, অর্থ কি বিনিময়ের মাধ্যম?
জীবন কিংবা মৃত্যুর? প্রেম কিংবা যৌবনের?
অসম্ভব, অর্থ শুধু অনর্থের বিনিময় দিতে পারে।
স্মরণকালের বৃহত্তম সভায় আজ আমি
সদর্পে ঘোষণা করছি, হে বোকা জমায়েত,
পল্টনের মাঠে আর কোনেদিন সভাই হবে না,
আজকেই শেষ সভা, শেষ সমাবেশে শেষ বক্তা আমি।
এখনো বিনয় করে বলছি, সাইরেন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে
আপনারা এই মাঠ খালি করে দেবেন।
এই পল্টনের মাঠে আমার প্রেমিকা ছাড়া
আর যেন কাউকে দেখি না কোনোদিন।
এই সারা মাঠে আমি একা,
একজন আমার প্রেমিকা.....।

কংক্রিটের কোটিল

ডাকটিকিটের মতো শহীদের রক্ত-কণা
লেগে থাকা স্ট্রীটে
একটি উজ্জ্বল খাম পড়ে আছে,
বিপ্লবের কোকিল কংক্রিটে।

ভালোবাসার পুরোনো বর্গায়

তেমন তীক্ষ্ণতা নেই, ভোঁতা তীর, যেন ঠাকুর্দার আমলের
খড়গ; ঝুলে আছে ঐতিহ্যের পুরোনো বর্গায়।
সাদা চামড়া ছিঁড়ে-খুঁড়ে ঢুকে যেতে পারে না কখনো।
গতিবিধি সীমায়িত, এশিয়ার শখণ্ডিত ম্যাপে গৃহস্থ বধুর

মতো বসে আছে লাজুক রমণী।
কেবল রবীন্দ্রনাথ তোমার প্রশংসা করে বলে
তুমি তাঁর পক্ককেশে ঝুলে
সুদূর বিলেত থেকে এলে একবার জয়ী হয়ে;
–যেন সারা জীবনের অপরাধ মোচনের অভিলাষে
জাহাজের ডেকে চরে নেমেছে মক্কায়।
নিজে নিজে বাঁচতে পারো না, পরনির্ভর, কাপুরুষ,
প্রেমিকের বাহুবলে বাঁচো, তোমাকে বাঁচতে হয়,
শব্দে চাবুক মেরে তোমাকে নাচাতে হয়।
তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে, কী আশ্চর্য,
সমস্ত যৌবন জুড়ে তর্ক ওঠে, আকাশে আগুন জ্বলে,
আন্দোলন বায়ান্নর পাঁচিল টপকায়।
তুমি তবু নির্বিকার,
ঝুলে থাকো ঐতিহ্যের, ভালোবাসার পুরোনো বর্গায়।

দৃশ্যে-গন্ধে-রক্তে-স্পর্শে-গানে

রাত্রি আমাকে বিপথ দেখালো,
–সকালের সূর্যালোকে, তৃষ্ণায়, বুকের ক্ষুধায়
আমরা বাঙলার পলির রুটিকে টুকরো-টুকরো করে
হিংস্র পশুর মতো ছিঁড়ে জননীর রক্তে ভিজিয়ে খেলাম;
এবং সূর্য যখন সমকোণে দুরন্ত দুপুর
তখন রক্তের পিচ গলে গেলে অদৃশ্য গ্রহের শ্বাসে
সুবাতাস এসে ফিরে গেলো।
প্রসন্ন বিকেল এসে একদিনও বললো না,
দেখো, ক্ষীণতম কটিদেশ, পুরো-বক্ষ,
আর জঙ্ঘার নরোম বিস্তারে, শিশুতোষে
লুক্কায়িত তোমার শৈশব দেখে যাও।

অথচ আমি তো অনন্ত শৈশব চাই,
প্রসন্ন বিকেলের মাঠে ফিরে যেতে চাই,
আমি মানুষের শুভদ্রতাকে চাই।
আমি মাধবীকে চাঁদ দেবো বলে,
সম্পন্ন সুখের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে গিয়ে
অনন্ত নিখুঁত সূর্যের আশায়
যেখানে রেখেছি চোখ সেখানেই আলোর তিমির।
আমি দৃশ্যে-গন্ধে-রক্তে-স্পর্শে-গানে
সুন্দরের অবয়ব পেতে চাই,
মধ্যরাত্রির স্বপ্নের মতো মাধবীকে চাঁদ দেবো,
নীলিমাকে দেবো নীলাকাশ,
আমাকে ফিরিয়ে দাও জীবনের সামান্য অধিকার।

নির্জন হীরা জ্বাললে

বিক্ষত হলে আঘাতে আঘাতে
আঁচলে বাঁধলে প্রেম,
বর্ণমিছিলে দুর্গের কোলাহল,
চোখের কালোয় সর্বনাশের মেঘ।
হাতের মুঠোয় নির্জন হীরা জ্বাললে–;
তোমার আমার ভালোবাসা তাই জমলো।
সাদা গঙুষে
জাগালে অশ্বক্ষুর,
খোঁপায় ফুটল
বিপ্লবী অংকুর।
বুকের শিল্পে রবিশস্যের গান,
কটির ধনুতে শত্রুনিধন বাণ।

বিক্ষত হলে আঘাতে আঘাতে
অঙ্গে মাখালে জ্যোতি,
অন্নহীনের বন্য-প্রতিশ্রুতি।
মোহন কাঁচুলি ঢাকল যখন শব,
তখনই কেবল তোমার আমার
ভালোবাসা সম্ভব।

শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ

চোখেতে গভীর স্রোত, বিধ্বংসের নায়াগ্রা প্রপাত
বিশ্রামহীন ভেসে যায় রোজ।
ক্লান্ত মাকড় যেন কানে এসে সরল পর্দায়
বাধে বাসা, অন্নহীন, গৃহহীন বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
প্রতিদিন আমার শিরায়, রক্তে, বন্ধ-দরোজায়
সাংকেতিক টোকা দেয় টক-টক অভিসারী প্রেমিকার মতো।
অতঃপর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
দরোজা খুলেই দেখি অহর্নিশ সমুখে দাঁড়ায়
আমারই প্রতিবেশী সদর আলী, নরেশ বাড়ই।
কী যেন বললো তারা, কান্না? প্রতিবাদ?
নির্মোক পাখির মতন আমিও তখন
ভুলে যাই সহজে কূজন,
চোখের দু'হাত দূরে খেলা করে সুজন অতীত।
আর মুহূর্তেই একটি বিদেশী যুবক,
সবল-পেশল দেহ, অতি কৃষ্ণকায়,
খাটো চুল, পুরু-ঠোঁট নিয়ে আমাদেরই
অসন্তুষ্ট জনতার সাথে মিশে যায়।
তখন চোখের দ্রুত গভীর প্রপাতে
ভেসে আসে অনন্তের জল,

সুদূর আফ্রিকা থেকে ভেসে-আসা
ছয়টি ফাঁসের বাঁধে আমার বঙ্কিম কন্ঠ
বেঁধে ফেলে কঠিন বাঁধনে।
তখন চৈতন্যলোকে নিশ্চুপ নিরুত্তর থেকে
চেয়ে দেখি পৃথিবীর বর্তমান দুখের বারুণী,
শিশুর হাতের বাঁশি গর্জে ওঠে নাপামের স্বরে।
আর আমি হয়ে যাই আমেরিকার শহরে-বন্দরে
কার্যরত, ক্লান্ত প্রাণ নিগ্রোদের মতো।
আমার দু'পাশে দুই নিগ্রো বালক
মলিন দু'হাত দেখে বলছে; 'দেখুন,
আপনার হাতের রেখা অবিকল আমার মতন,
আমি খুব নিদ্রাতুর, আপনার হাতের তালুতে
কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতে পারি?'
হাজার হাজার শিশু প্রতিদিন এইভাবে
হাতের তালুতে, বক্ষে, দেহের শিরায় নিদ্রা যেতো,
দেশে দেশে সুশোভিত পৌরুষের কমল ফোটাতো।
'গৃহস্থের খোকা হোক'-বলে যে সবুজ পাখি
প্রতিদিন ডাকতো হৃদয়ে, শান্তির সেই পাখি
গতরাত শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ হলো।
আর তাই বুঝি আমি, আমার তালুতে, বক্ষে,
দেহের শিরায় ঘুম-যাওয়ার সব শিশু
কেঁদে কেঁদে উড়ে গেল পাখির মতন;
নিহত শান্তির দেশে শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ হতে।

প্রতিদ্বন্দ্বী

ভালোবাসার কোমল হাত অনেকবার
অন্ধকারে

বন্যতারে
ডাক দিয়েছে, নরম মুখে পূর্ণিমাকে
সঙ্গোপনে
ক্লান্ত মনে
স্থান দিয়েছে রুক্ষ বুকে দুঃখ যতো।
কিন্তু এ কী হৃদয়হীনা ছায়ার মতো
রক্তহীনা
সূক্ষ্ম ঘৃণা
অবিরত ফ্যাকাশে মুখ নতুন রোদে
বিভীষিকা
চণ্ডালিকা
দেখিয়ে দিলো সবচে' বড়ো দৈন্যতাকে।

স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়

স্বপ্ন-জড়ানো অবাক কণ্ঠে
আঁধার পালালো
সাদা পালকের শারদ সকালে
নবজাতকের পদ্মচোখের সহসা আড়াল;
লাল উদয়ন নয়ন মেলালো
গন্ধ ছড়ানো
পুবের আকাশে রক্তের ছাপ
লাল প্রচ্ছদ; নিপুণ তুলির
হলুদ ফড়িঙ
আমরা ক'জন আগামী দিনের
চক্রবর্তী, পৌরহিত;
সবুজ ধানের ষোড়শী শীষের
নিরাপদ দূরে পাহারায় রত

শুয়েছি অনেক বন্ধ্যা রাত,
পাইনি ফলের লোভন পরশ একটুক্ষণ।
অথচ গীতাই ভেবেছি সঠিক
'মা ফলেষু কদাচন..'
সকাল-সন্ধ্যা বন্ধ্যাদিনের বিফল বিলাপ
স্পর্শ বিলালো, অক্ষমতায়
ক্ষমতাচ্যুত ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার
বিফল দর্পে রাত্রি যেমন
কাঁপায় নিত্য নিষ্ফলতায়
জরা ও ব্যাধির মৃত্যুশ্বাসে
নিয়ত অধীর কান্নার স্রোত
আমার মায়ের নিকানো উঠান
ভিজিয়ে দিয়েছে ব্যর্থতায়
সুচতুর শ্বাস, বিবর্ণ ছায়া,
ভূতের আঙুলে রক্ত মেখে
কালো পীচ দিয়ে অ্যাভিন্যুর পথে
কালো চক্ষুর ক্রন্দন ঢেকে
পথ চলে নির্লজ্জায়
আমার দেহের কোন ছায়া নেই
মাথার উপরে সূর্য এখনো
সজোরে রক্ত দিচ্ছে যদিও জ্বালিয়ে
তবু তো পারিনি হায়েনার মতো
লুটে নিতে কোনো জীবন সাধও,
তালা দেয়া দ্বার ভাঙতে পারিনি
হাতের মুঠোয় এলো না কখনো
নারীর বুকের গোপন চাঁদও
একটু আগেই ডাক দিয়ে গেছে
পাড়াগাঁর এক সুকান্ত মুখ :

‘গাঁয়ে চলে এসো,
শহরে মড়ক, নরক যাতনা,
নিত্য অসুখ চেতনার পাখি
শতাব্দীর,
সভ্যতা হবে মাটি চাপা পড়ে
হাজারো বছর অঙ্গে মেখে,
অক্ষমতার বুকের পাঁজর
সেদিনও হাসবে আজকের মতো
খোদাই পাথরে ক্ষমতাসীনের আদর দেখে?
দেশের করুণ শিথিল বক্ষে
কান পেতে আছি,
ঘুম পাবো বলে শুয়ে থাকি রোজ
শুয়ে থেকে থেকে
ঘুম ভেঙে যায়—
দেশের শীতল বক্ষ পারে না
দুঃখ ভোলাতে; শব্দ ফেরাতে
নাপাম বোমার,
দখিন-পূর্ব এশিয়াবাসীর
বিস্ফোরণ —
আমিও পারিনি ক্লেদজর্জর
রক্তের ছাপ, বুভূক্ষার
স্বদেশের বুকে শেফালি পাতায়
রেখে দিয়ে যেতে সুনির্ভর,
স্বপ্নের ধোঁয়া কুয়াশার মতো
পারিনি ছাড়াতে আকাশময়
শাণিত দিনের সোনারঙ রোদে
কখনো পারিনি সচ্ছল চাঁদে উড়তে
ব্যস্ত স্বদেশ, কার চিৎকার

কে শোনে কখন; সবাই ব্যস্ত।
নীল জোছনায় জোনাকির কাঁদা
সুভদ্রা যৌবন
ফিরে ফিরে যায় পাখালীর মতো
ক্লান্তি এলেই নীড়ে;
আমিই তখনো লুন্ঠিত হই
অবগুন্ঠন খুলে দিই তার
কিছু কাব্যে ও কিছু প্রশংসায়
ছত্রভঙ্গ জনতার মীড় মীড়ে
অন্নহীনের দর্শন কিছু নেই
সহজেই কাঁদে
চলচ্চিত্রের নায়িকার মতো
দুঃখেও হাসে সহজেই।

কলম

কনক, তোমাকে লেখার কলম
হারিয়ে ফেলেছি। এখানেই, এই
পার্কের ধারে, সবুজ ঝাউয়ের
বামপাশ ঘেঁষে সুনীল পাখিটা
উড়ছে যেখানে, নির্জন-লেকে
তার পাশাপাশি। সকাল সন্ধ্যা
তাই তো এখন খাকী-পোশাকের
হাজার বালুচ পাহারা দিচ্ছে
লেইকের জল, বাঙলা কবিতা,
রক্তের নদী, শিমুলের গান।
কনক, তোমাকে লেখার কলম
হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি?

হিমাংশুর স্ত্রীকে

আমাকে বিশ্বাস নেই হিমাংশু, কোনো কিছুতেই কোনো কিছু না পাওয়ার ক্লিন্ন অবসাদ আমার শরীরময় পাপ; স্বপ্ন যদি আমার অনুভবে জনতার বিপ্লবের কথা বলে, দুঃস্বপ্ন আমার রক্তে কণায়-কণায় অন্য এক প্লাবনের গান গেয়ে যায়। মুখের গোলাপ যদি সূর্যালোকে স্বর্ণের মতো ফোটে, বুকের গোলাপ তখন গায়ে কাদা মেখে যন্ত্রণায় নীল হয়ে কাঁদে। আমি যখন ঘুমোতে যাই, তখন শয্যাময় লুকানো দুঃস্বপ্ন এসে আমাকে জড়ায়। আমি জনতার শত্রুকে গুলিবিদ্ধ করে পুলিশের তাড়া খেয়ে রাত্রির অন্ধকারে যখনই পালাতে যাই, তখনই তোমার স্ত্রীকে পাই প্রতিদিন, আমার মঙ্গলময় পথের সিদ্ধান্তে সে এসে আগলে দাঁড়ায় সমুখের সকল গন্তব্য; সজ্ঞানে ডিঙাতে গেলেই আমার অজ্ঞান দেহ বাঁধা পড়ে তার আলিঙ্গনে। আমি সব কিছু ভুলে যাই, আমাকে বিশ্বাস নেই হিমাংশু, আমি কোনো কিছুতেই কোনো কিছু না-পাওয়ার অভিমানে একজন জলজ্যান্ত পাপ, খাপহীন তলোয়ার নিয়ে আমরা দু'জন তাই গতকাল সারারাত ধরে যে-যুদ্ধের শরীর দেখেছি, সেখানে স্পষ্টত জীবন থেকে যৌবন, স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন, সিদ্ধান্ত থেকে গন্তব্য, গন্তব্য থেকে আলো; খণ্ডিত বাঙলার মতো যেন চিরকাল মীমাংসিত সত্যে আলাদা।

অর্জুনের রাজ্য

আমি কোনোদিন যুদ্ধ দেখিনি, শুনেছি বাবার মুখে,
সেই কবে বাবা যখন সবেমাত্র নববিবাহিত–;
আমি নবদম্পতির প্রেম, জননীর গভীর লজ্জায়
চিহ্নহীন অচিন বালক, সেই কবে ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি
একদিন হঠাৎ বিকেলে একঝাঁক পাখিদের মতো
কিছু বোমারু বিমান বাবার ওপর দিয়ে,
আমাদের গ্রামের মানুষ আর বুড়ো বট গাছটার পাতাগুলো
ছুঁই-ছুঁই করে উড়ে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগর হয়ে
জাপানে, বার্মায়।
আমি কোনোদিন যুদ্ধ দেখিনি, শুনেছি অন্যের কাছে,

ইতিহাসে, পাঠ্য সিলেবাসে। পরীক্ষায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
এসেছিল একবার, আমি যুদ্ধ না-দেখেই চর্বিত চর্বনে
লিখেছি অনেক কথা, সভ্যতা বিরোধী এর নিপুণ ভূমিকা।
চীন আর ভারতের সীমান্ত বিরোধে, ১৯৬২-তে,
আমার এক আত্মীয়ের দূরের আত্মীয় মারা গেলে
আমি তাকে কাঁদতে দেখেছি সারারাত,
যুদ্ধে নিহত তিনি, তাই বুঝি বেশি করে কাঁদা, অথচ
ব্লাডপ্রেসারের রোগী কল্যাণের বাবা এমনিতেই মারা গেলে
আমরা কাউকে কিছু দোষ দিতে পারিনি তখন,
কল্যাণ তো কেঁদেছে তখনও।
১৯৬৫-তে আমরা বড় আশঙ্কায় ছিলাম,
বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন–
–তার এক ছেলে শত্রুদেশে, সেনাবাহিনীতে,
তাই ভয়। লাহোরের কাছে যখন ট্যাঙ্ক যুদ্ধ হয়,
তখন ঢাকায় ছিল নিষ্প্রদীপ আলোর মহড়া।
আমি কল্পনাকে ছুঁতে গিয়ে অন্ধকারে হাত রেখে
কল্পনার মায়ের শরীরে, বলেছি যুদ্ধের কথা,
যুদ্ধ হোক, যেখানেই যুদ্ধ হোক জয়ী হবে
শক্তিশালী বৃটেন, ইউএসএ।
এরোপ্লেন আসে না এখানে, শুধু পত্রিকায়
বোমারু বিমান থেকে বোমা ঝরে।
কালো ট্যাঙ্ক মুখরা নারীর মতো অসভ্য ভাষায়
কী কথা বোঝাতে চায় আমি তার কিছুই বুঝি না।
শুধু জেনেছি অন্যের কাছে, বাবা যখন নববিবাহিত,
আমি নবদম্পতির প্রেম, জননীর গভীর লজ্জায়
চিহ্নহীন অচিন বালক, তখন পাখির মতো
ঝাঁক বেঁধে হাজার বিমান উড়ে যেতো;
বঙ্গোপসাগর হয়ে জাপানে, বার্মায়।

মানুষ

আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষগুলো অন্যরকম,
হাঁটতে পারে, বসতে পারে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়;
মানুষগুলো অন্যরকম, সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়।
আমি হয়তো মানুষ নই, সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকি,
গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকি।
সাপে কাটলে টের পাই না, সিনেমা দেখে গান গাই না,
অনেকদিন বরফমাখা জল খাই না।
কী করে তাও বেঁচে থাকছি, ছবি আঁকছি,
সকালবেলা, দুপুরবেলা অবাক করে
সারাটা দিন বেঁচেই আছি আমার মতো। অবাক লাগে।
আমি হয়তো মানুষ নই, মানুষ হলে জুতো থাকতো,
বাড়ি থাকতো, ঘর থাকতো,
রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে নারী থাকতো,
পেটের পটে আমার কালো শিশু আঁকতো।
আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে আকাশ দেখে হাসবো কেন?
মানুষগুলো অন্যরকম, হাত থাকবে, নাক থাকবে,
তোমার মতো চোখ থাকবে,
নিকেলমাখা কী সুন্দর চোখ থাকবে।
ভালোবাসার কথা দিলেই কথা রাখবে।
মানুষ হলে ঊরুর মধ্যে দাগ থাকতো,
চোখের মধ্যে অভিমানের রাগ থাকতো,
বাবা থাকতো, বোন থাকতো,
ভালোবাসার লোক থাকতো,
হঠাৎ করে মরে যাবার ভয় থাকতো।

আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা
আর হতো না, তোমাকে ছাড়া সারাটা রাত
বেঁচে-থাকাটা আর হতো না।
মানুষগুলো সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়;
অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি।

ইনসমনিয়া

শুয়ে পড়ো অন্ধকার, অনেক তো রাত হলো,
কত আর জেগে থেকে শূন্য রুমাল দিয়ে বানাবে চড়ুই,
মাসিমার মেয়েগুলো আজ আর ঘুমাতে যাবে না।
বাবুল ফেরেনি আজও, পাশের বাড়িতে তাই
বাবুলের বাবা জেগে আছে। অস্পষ্ট আলোয় ভাসা
পিতৃত্বের নিদ্রাহীন রাত দেখে দেখে আমি তবু পিতৃত্বের
স্বপ্ন ভালোবেসে অন্ধকারে জেগে বসে আছি।
কে জানে কী সুখ ছিল নারীর চুম্বনে।
ভালোবাসা বুকে নিলে সটিবনে ছায়া পড়ে কার?
আমার অনিদ্র রক্তে প্রতিদিন কিসের চিৎকার?
আমি তো পাশেই আছি, আমাকে জড়িয়ে ধরে
শুয়ে পড়ো, অন্ধকার, আমি তো পাশেই আছি।
আমাকে কারো খুঁজতে হয় না, নিজেই এগিয়ে যাই,
ধরা দিই, ভালোবেসে রাত্রি জেগে থাকি।
অনেক তো রাত হলো, বাবুল ফেরেনি কেন?
মাসিমার মেয়েগুলো আজ কেন ঘুমুতে এলো না?

লজ্জা

আমি জানি, সে তার প্রতিকৃতি কোনোদিন ফটোতে দেখেনি,
আয়নায়, অথবা সন্দ্বীপে বসে যেরকম
সর্বনাশা সমুদ্র দেখা যায়, তার জলে
মুখ দেখে হঠাৎ লজ্জায় সে শুধুই ম্লান হতো একদিন।
আমি জানি পিঠ থেকে সুতোর কাপড়
কোনোদিন খোলেনি সে পুকুরের জলে, লজ্জা,
সমস্ত কিছুতে লজ্জা; কণ্ঠে, চুলের খোঁপায়, চোখের তারায়।
আমি জানি আসন্নপ্রসব-অপরাধে, অপরাধবোধে
স্ফীতোদর সেই নারী কী রকম লজ্জাশীলা ছিল!
অথচ কেমন আজ ভিনদেশী মানুষের চোখের সমুখে
নগ্ন সে, নির্লজ্জ, নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে
জলাধারে পশু আর পুরুষের পাশে শুয়ে আছে।
তার ছড়ানো মাংসল বাহু নগ্ন,
কোমর, পায়ের পাতা, বুকের উত্থানগুলো নগ্ন,
গ্রীবার লাজুক ভাঁজ নগ্ন;–কে যেন উন্মাদ হয়ে
তার সে নিঃশব্দ নগ্নতায় বসে আছে।
তার সমস্ত শরীর জুড়ে প্রকৃতির নগ্ন পরিহাস,
শুধু গোপন অঙ্গের লজ্জা ঢেকে আছে
সদ্য-প্রসূত-মৃত সন্তানের লাশ।
তার প্রতিবাদহীন স্বাধীন নগ্নতা বন্দী করে এখন
সাংবাদিক, ঝুলন্ত ক্যামেরা নিয়ে ফটোগ্রাফার
ফিরে যাচ্ছে পত্রিকার বিভিন্ন পাতায়। অসহায়,
সূর্যের কাফনে মোড়ানো আমার বোনের মতো এই লাশ
আগের মতন আর বলছে না, বলবে না :
'আমি কিছুতেই ছবি তুলবো না....'
যেন তার সমস্ত লজ্জার ভার এখন আমার।
কেবল আমার।

যুদ্ধ

যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা,
যুদ্ধ মানেই
আমার প্রতি তোমার অবহেলা।

পুনরুদ্ধার

কালোবাজারী আর দুষ্কৃতকারী মানুষের খোঁজে
ঘরে-ঘরে হানা দিলো রক্ষী-পুলিশ।
সিগারেট, অস্ত্রশস্ত্র, হাইজ্যাক-করা গাড়ি
পাওয়া গেলো কিছু কিছু, কিছু কিছু খারাপ মানুষ
হলো জোড় হাত। শুধু সেই লক্ষ্মীমন্ত নারী তার
বুক থেকে খসে-যাওয়া হারানো বোতাম খুঁজে
পেলো না কোথাও। শুধু সেই পিতা তাঁর একমাত্র
ছেলেকে পেলো না, যে-তরুন অস্ত্র হয়ে
একদিন ঘর ছেড়েছিল।

****সমাপ্ত****